শিয়র ও শিরোস্ত্রাণ নিয়ে একগুচ্ছ রাফসডি

শিয়র ও শিরোস্ত্রাণ নিয়ে একগুচ্ছ রাফসডি

টি এম কায়সার

কাগজ প্রকাশন

শিয়র ও শিরোস্ত্রাণ নিয়ে একগুচ্ছ রাফসডি
টি এম কায়সার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৪

প্রকাশক
কাজী শাহেদ আহমেদ
কাগজ প্রকাশন
কাগজ প্রকাশন, বাড়ি-৮৪, লেভেল-৩, রোড-৭/এ,
সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা

প্রচ্ছদ
নরোত্তম দুবে

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২-এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/book/publisher/913

ISBN: 978-984-98864-3-3

মূল্য
২২০ টাকা
US $ 10

Shior o Shirostran Niya Ekguccho Rafsodi by T M Ahmed Kaysher Published by Kagoj Prokashon, House-84, Level-3, Road-7/A, Dhanmondi, Dhaka-1209, Bangladesh, First published in July 2024, Cover designed by Narottama Dobey, Price: Tk. 220, US $ 10

উ ৎ স র্গ

সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে আমি খানিকটা ঈশ্বরের মতোই চাহিবামাত্র জগতের সকল বান্দাদের জন্য, বন্ধুদের জন্য, পাহাড়ে ধ্যানাবিষ্ট সন্তদের জন্য, যারা আমার প্রেমিকা হতে পারত অথচ ঘটনাচক্রে আমলা ও কালোবাজারির বউ হয়ে এদেশ ওদেশ ঘুরে সংগ্রহ করছে বিচিত্র সব বৃতি ও ভ্রূণ, তাদের সকলের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি! ফেসবুকে, ইন্সটাতে কেউ লাইক চাইলে লাইক, লাভ চাইলে লাভ, যে ছবি আমি মোটেও পছন্দ করছি না; বানান ভুল, বাক্য ভুল যে পোস্টগুলো একবার দেখে দ্বিতীয়বার পাঠ করারও রুচি হবে না, এমন সব লেখার নিচে 'দুর্দান্ত' 'অনবদ্য' লিখতে গিয়ে একটুও হাত কাঁপে না!

শুধু ফ্রাইডেটা খুব স্পেশাল! এই দিন তুমি আমার কথা ভেবে দুবেলা উপোস দাও, শয়নঘরে ধূপকাঠি জ্বালো—এই দিন মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা থাকলেও আমি তোমার রোদে স্নান করি, যে বইয়ে তুমি নেই, যে সিনেমায়, যে পর্নোগ্রাফিতে এবং যেসব নিসর্গ-দৃশ্যে তুমি নেই, তা আমি সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করি! তোমার স্তন, গলা ও কানের লতির ঘ্রাণ ভেসে আসতে থাকে পার্কের শ্যাওড়া ঝোপ থেকে, ফলে ফ্রাইডেতে রোদ না উঠলেও তুমি আমার, একশ লক্ষবার আমাকে হেয় ও হনন করে গেলেও ফ্রাইডেতে সারা দিন আমি লাইক দেই তোমার গলার ভাঁজে, লাভ দেই স্তনবৃন্তে, কমেন্ট করি তোমার অগ্নি-নাভিমূলে! এই দিন গ্রিক রূপসীর সরব, সংগীতময় এবং ইঙ্গিতপূর্ণ হাতছানিতেও কিছুই যায় আসে না, এই দিন সারা রোমবাসী মিছিল করে আসলেও আমি নির্বিকারভাবেই সূর্যের চারদিকে যে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে তার আশ্চর্য সুন্দর গতি অবলোকন করি এবং অবলীলায় প্রকাশ করি। হাতে কোনো রকম অস্ত্র ছাড়া এ আমার একমাত্র নিঃশর্ত সমর্পণের দিন, তোমার কাছে এবং ফলে, তাবৎ জগতের কাছে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কাছে।

তুমি উপোস দাও তবু এই দিন স্কাফেল পাইকের চূড়া থেকে একটা নিরীহ চুম্বন ছুড়ে দিলেও তোমার জঙ্ঘায় তা ভ্রূণ হয়ে প্রস্ফুটিত হয়, ধীরে—আমি জানি!

এই কবিতাগ্রন্থ তোমাকে ও আমাদের এরকম অজস্র ফ্রাইডের কথা মনে রেখে...

রূপকুমারী নদীর চুম্বন ও কায়সারের কবিতায় প্রেমের যাপনচিত্র

পাবলো নেরুদার Veinte poemas de amour y una cancion despereda 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা ও একটি বিষাদগাথা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে। কাকতালীয়ভাবে ঠিক ১০০ বছর পর টিএম কায়সারের 'শিয়র ও শিরোস্ত্রাণ নিয়ে একগুচ্ছ রাফসিডি' (২০২৪) কাব্যগ্রন্থের রূপকুমারী নদীর চুম্বনসমৃদ্ধ কবিতাগুলো পাঠ করতে করতে পাঠকের চিরপ্রেমিক ও বিপ্লবী কবি পাবলো নেরুদার কথা ভীষণভাবে মনে পড়বে, মনে পড়বে এই কুড়িটি কবিতার কথা।

মনে পড়বে Body of a Woman পাবলো নেরুদার প্রথম প্রেমের কবিতাটির কথা। আমরা দেখতে পাই—

> Body of a woman, white hills, white thighs,
> You look like a world, lying in surrender.
> My rough peasant's body digs in you
> and makes the son leap from the depth of the earth.
> I was alone like a tunnel. The birds fled from me,
> And night swamped me with its crushing invasion.
> To survive myself I forged you like a weapon,
> like an arrow in my bow, a stone in my sling.
> ....
> ....
> Body of my woman, I will persist in your grace.
> My thirst, my boundless desire, my shifting road!
> Dark river-beds where the eternal thirst flows,
> and weariness follows, and the infinite ache.
> [Translated by W.S. Merwin]

প্রচলিত প্রেমের কবিতার ভাব ও অনুভবের ছাঁচ ভেঙে কবিতার মুক্তি দিয়েছিলেন পাবলো নেরুদা। নেরুদার একাকিত্ব ও শূন্যতার অনুভূতির শারীরিক প্রকাশ এই কুড়িটি কবিতা। নারী হচ্ছে সেই একাকিত্ব থেকে মুক্তির কিংবা উত্তরণের প্রথম ও শেষ পথ। শরীরের মাধ্যমে যে বাৎসায়নিক দর্শনের চর্চায় একীভূত হতে দেখি কবিকে, সেই একই অভিজ্ঞানে বিংশ শতকের শেষ দশকে এসে একজন বাঙালি তরুণ কবি লেখেন—

এক প্রলয়ংকরী চুম্বনের পর

বলিনি? এই চুম্বনগুলোই টিকে থাকবে
এই সব মরণশীল মাঠ নদী প্রেম স্মৃতি ও গ্রহানুপুঞ্জ
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাবে সব, ধীরে

এই যে দাঁড়িয়ে আছি সহস্রবর্ষ প্রাচীন প্যাগোডার নিচে
এই দৃশ্যে অক্ষয় শুধু আমাদের জলোন্মাদ ওষ্ঠ-অভিসার
চতুর্দিকে যা দেখছ—কালগর্ভে লুপ্ত হবে সব

শুধু লক্ষ সৌরবর্ষ পরও আমাদের ছায়া
তারপর আমাদের ছায়ার ছায়া, ছায়ার ছায়ার ছায়া
ছায়ার ছায়ার ছায়ার ছায়া...পান করবে একে অপরের রক্ত
একে অপরের আত্মা
একে অপরের অস্থি এবং অস্তিত্ব
ইসরাফিলের শিঙা বেজে ওঠার পরও...

কায়সারের এই সাহস কখনোই মিলত কি না জানি না, যদি পাবলো নেরুদা প্রেমের এই অ্যানার্কিস্ট পর্যায়ের কবিতা না লিখতেন।

চিত্রকল্পের বাস্তবতায় প্রবাহমান যান্ত্রিকতার বিপরীতে স্পর্শযোগ্য সততায় সম্মোহিত হয়েছিলেন পাবলো নেরুদার পাঠকগণ। নেরুদা ও কায়সার জানেন কবির মূল কাজ হচ্ছে ভাষা দিয়ে সেতু রচনা করা, আর প্রেমের বেদনা নয় শুধু বিচ্ছেদের, দূরত্বের, অপরিচয়ের, অসম্পূর্ণতার বর্ণনা, উৎকণ্ঠার রূপায়ণকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করাই মূল কাজ কবির। তা ছাড়া উপস্থাপিত অনুভব ও বোধ মূলত কোন তাত্ত্বিকরূপে কবিদ্বয় ধারণ করলেন, সেটা আমাদের দেখার বিষয়। নেরুদার মতোই প্রকরণ ও চিন্তার অনুভূতির বদল ঘটেছে কায়সারের বিভিন্ন কবিতা থেকে কবিতা যাপনে। নিরাভরণ এই কবিতাগুলোকে আবেগের সততায় আবর্তিত বলে সেলাম করতে ইচ্ছে হবে পাঠকের। কায়সার সেমিটিক মিথের ইসরাফিলের শিঙার ফুঁয়ের পরেও প্রেমের জয়গান জাগরূক রেখেছেন—যা ভিন্ন বিপ্লবের বা ফুকোর বিনির্মাণের দিকে যাত্রার অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এখানে নেরুদা থেকে আলাদা কাজ প্রকরণ এবং বোধে তিনি।

পাবলো নেরুদার একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

> দুই ধরনের ভালোবাসার কথা আছে 'ক্রেপুস্কুলারিও'তে। আমার গ্রামীণ বয়ঃসন্ধিকাল ভরে রেখেছিল একরকম প্রেমে আর নগরে অপেক্ষা করছিল আমার জন্য আরেক ধরনের প্রেম, স্যান্টিয়াগোর গোলকধাঁধায়। কুড়িটি প্রেমের কবিতায় এসে দুটি প্রেমেই মিলিত হয়েছে পৃষ্ঠার এপিঠ-ওপিঠ—তার একটিতে যদি বনের উদ্ভাস, তবে অন্যটিতে মধুর অন্ধকারের যবনিকা। [অনুবাদ : আলী আনোয়ার]

নেরুদার মতোই কায়সারের কৈশোর থেকে মধ্যযৌবনের যাপনচিত্রে দুটি শহরের প্রভাব অনিবার্যভাবে তার কবিতায় প্রতীয়মান। এক মফস্বল শহর সিলেট ও অন্যটি ইংল্যান্ডের লিডস নগরী। এই গ্রামাক্রান্ত শহর সিলেট ও তার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্লোকে যেখানে প্রগাঢ় শরীরী প্রেমের যাপনচিত্র না চাইতেই ঘটে গেছে নেরুদার মতো কোন এক 'মাতিলদে'র সঙ্গে; তা না হলে এমন কাব্যগ্রন্থ লেখা যৌবনে সম্ভব হতো না কায়সারের। বিলম্বিত এই প্রকাশ অনেকটা অভিমানে, সে গল্প অন্য কোথাও হবে একদিন।

হৃদস্পন্দন ঘটবে বোধে, ধরা পড়বে নস্টালজিক হীরন্ময় স্মৃতি। স্মৃতিরা যেন হীরকরেণুর মতো ঝরছে কখনো রূপকুমারী নদী, কখনো রত্না নদী, কখনো শঙ্খ নদীর মতোই অচেনা বিলেতের দুঃখী নদীর জলে অথবা ওয়ার্ফ নদীর নির্জন বাঁকে।

আমরা কখনো ধ্যানোন্মাদ সংগমের মতো ঢেউ তুলে পাল খুলে সেই নদীতে নেমে পড়ি—তীব্র অবগাহন শেষে কবির সঙ্গে সৌরভ ভরা ধ্যানে জেগে থাকি, ডুবে মরে বেঁচে উঠি রূপনারাণের কূলে।

গাঢ় আর গূঢ় চুম্বনের স্মৃতিই ধরা থাকে বরফের মাঝে, উষ্ণতা দেয়—রক্তাক্ত হতে হতে আবার ভেসে উঠি আনন্দ বিভঙ্গে।

> রূপকুমারী নদী ছায়ায়
> একাকী অভিমানী প্রেমিক
> গোঁ ধরে বসে থাকি?

কে না এমন অভিমানে আত্মমেহনে নিজেকে নবাবকুল শিরোমণি ভাবিনি একদিন! অথচ আশ্চর্য এই অভিমান শব্দটির যথার্থ ইংরেজি আছে কি? আহা অভিমান আহা!

তিরবিদ্ধ হরিণ শাবকের মতো আহত হৃদয়ে ভীমপালশ্রীতে গাইছি, জীবনের আর্তকথা, শেষ ব্যালাড, সেই রক্তাক্ত প্রেমিকই তো গাইতে পারে যিনি প্রেমের অমৃতবিষ করেছে পান।

নেরুদার মাতিলদে, হিমেনেথের প্লাতেরা, জীবনানন্দের বনলতা সেন, শঙ্খ ঘোষের গান্ধর্ব, আল মাহমুদের আয়েশা আক্তারের মতো রক্তের অন্তস্রোতে কায়সারের যে সখী খেলা করে তাকে তিনি বলতে চান—

> কেন যে ফেরাতে চাও? আমার তো রক্তে সখী
> আবাল মাটির ডাক, অনন্ত গুহাব্রত, আমূল সন্ন্যাস

সত্যিই তিনি আমৃত্যু সন্ন্যাসী, তাকে হাতছানি দেয় হাওড় আর প্রকৃতির চেনা অচেনা বৃক্ষকুল, তাকে ডাকে ইউরোপের বিশেষ করে লিটসের সেই ঘুমন্ত আদুরিয়া দুঃখী নদী; যে নদীর সঙ্গে তার পূর্বজনমের টান, যে নদী কখনো তাকে

তার বালকবেলার সুরমা, কুশিয়ারার উত্তাল প্রেমোন্মাদ যৌবনের কথা ভুলতে দেয় না, ইংল্যান্ডের লিটসের সেই নদী ওয়ার্ফ। আহা সৌভাগ্যবান ওয়ার্ফ।

ঘুমন্ত নদী ও চন্দ্র, উড্ডীন বালিহাঁস
হাতছানি দেয় নিরবধি
জোছনায় নয় শোনো, বিস্তীর্ণ অন্ধকারে মুখ ঢেকে রাখি

এই 'সখী' আক্ষরিক অর্থে কবি সিলভিয়া প্লাথ বটে, তবে তার মানস-প্রেমিকা কখনো গ্রিক কোনো অপরূপা বায়োলিন বাদিকা হলেও, এ যেন কোনো ইয়াসমিন, জেসমিন, প্রেমেশ্বরী, আল মাহমুদের চুল খোলা আয়েশা আখতার।

কিংবা 'গন্ধর্ব, তোমার হাত ছুঁয়ে/এই শিলাগুল্ম চিরজাগরূক
বোধ নিয়ে আসে কিংবা শঙ্খ ঘোষ যখন বলেন,

যদি বলি হাত ধরো ভয় পাও, সেবার হাতের
ভিতরে আরেক হাত জেগে ওঠে।

কায়সার লিখেন—

বারুতখানা রোডের ধারে হাঁটছি যখন
স্লাবের চিপায় পা ঢুকিল হঠাৎ কখন
গোঁসাই, আমার হাত ধরো নয় ভেসে যাব
চেনার স্রোতে

সেমিটিক গদ্য বলছি দ্বিতীয় ভাষ্যে লেখা 'হস্ত বিবৃতি', 'সেলুলয়েড কাব্য' যেখানে বিগত জন্মের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় পুনর্জন্মের পুরাণকথা। কে বলতে পারে সেই দুঃখী নদীর কথা ছিল কি না?

স্মৃতিভাষ্য, স্মৃতিপুরাণ, আর স্মৃতিতে বসবাসই মনুষ্যজন্মের প্রাগ-ইতিহাস উৎসারণ। প্রেমের মরা জলে ডোবে না, শাশ্বত প্রেম মানুষকে বাঁচায়, অক্সিজেন দেয় অবিনাশী সময়ে। অন্তর্গত দীর্ঘশ্বাসের যে আত্মঅনুসন্ধান একজন প্রেমিককে কীভাবে অভিমানী করে তোলে দেখুন 'মনোলগ' কবিতায় প্রতিস্থাপিত হতে দেখি—

দৌড়াও নিঃস্ব হয়ে
রাত্রি এলে আশ্রয় নিও নতুন নতুন সরাইখানায়
আর পথিমধ্যে যদি আবার কোনো রক্ত, অশ্রুও হৃদয় খেকোর
সঙ্গে দেখা হয়
তাকে খেতে দিও অবশিষ্ট রক্তধারা
ধোয়ামোছা নতুন হৃদয়।
এ যে ভয়ংকর প্রেমানুভূতি। তীব্র রূঢ় বাস্তবতার ফসল।

'শিশির' কবিতায় ভাস্কর চক্রবর্তীকে মনে পড়বে আমাদের—ভাস্কর যেন মধ্যবিত্তের পলায়নপর অস্তিত্বের স্মারকগাথাই লিখেছেন—

> এখনও আমি বেঁচে আছি ঘুরে বেড়াচ্ছি ভাবতেই অবাক লাগে কেমন
> কিরোর মতে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল গতবছরেই...

কায়সার তার নিজস্ব ঘরানায় আমাদের কিরো কিংবা কোনো জ্যোতিষবিজ্ঞানের নাম করা জ্যোতিষী ছাড়াই বলেন—

> মধ্যরাতের পর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না
> এই যে মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে মৃত সব কঙ্কালের বিলাপ

আহা সেই নিঃসঙ্গ ডাহুক যেন বাল্মিকীর হাতে তিরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ, সঙ্গিনীর মৃত্যুর পর একা নিঃসঙ্গ ক্রৌঞ্চ কবি।

'রাত তিনটে চল্লিশ মিনিট' কবিতায় নিঃসঙ্গতার জার্নালে প্রতিটি কবিতা যেন একজন একাকী নিঃসঙ্গ পথিকের আর্তনাদ। যে কিনা সরাইখানার ঠিকানাহীন এক নিঃস্ব প্রেমিক, যার শরাবের নেশায় ধ্যানস্থ হয় মাতাল যুবক-যুবতী।

> গলায়, কপালে ও কানের লতিতে চুম্বন করতে
> গিয়ে আঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে

সত্যি রবীন্দ্রনাথের সেই 'ওগো আকরুণ, কী মায়া জানো মিলন ছলে বিরহ আনো'।

কিংবা গীতিকবি কবীর সুমনের

> এ তুমি কেমন তুমি চোখের তারায় আয়না ধরো!
> এ কেমন কান্না তুমি আমায় যখন আদর করো।

এই 'গোঁসাই' প্রেমিকাও যেমন তেমনি তার পরমাত্মাও বটে। এখানেই হুয়ান র‍্যামন হিমেনেথ, পাবলো নেরুদা থেকে আলাদা কায়সার। এমনকি শঙ্খ ঘোষ ও আল মাহমুদ থেকেও। 'কালসাপ' কবিতায় কিন্তু এমে সেজায়ারের মতো দেশে ফেরার আকুতি লক্ষ করব। এটি কি তার বিলেতে থাকার যাপনচিত্র? অভিবাসী মন বারবার স্বদেশি নিঃশ্বাসের খোঁজে আত্মিক অনুভূতির তাড়নায় শিকড়ে ফিরতে চায়।

> পায়ের তলায় হুল ফুটেছে, বিষে মরে যাইগো
> দারুণ বিষে মরে যাই আমি কেমনে দেশে যাই

কখনো মনে হবে ভবা পাগলার গান কিংবা রামপ্রসাদী, তবে কায়সার যখন বলেন, 'বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ঈশান কোণে মেঘ জমিল কোন আঁধারে কোন বাদাড়ে এই দেহখান থুই?' তখন আবদার করে গুল্মকাঁটা হাটুইমা পথের কাদায়

আমরা হাওড়পারের মরমিয়া এক নতুন বাউলের খোঁজ পাই। এ যাত্রায় খুব কমই তিনি এঁকেছেন বুদ্ধ নামে 'নখ ও জিভ বিষয়ক' 'রক্ত-বুদবুদ' কিংবা 'জীনপুর' বিষয়ক অহিংস কবিতা। যেখানে অন্যবিশ্ব থেকে এই দেহাত্মা প্রেমাত্মা ভিন্ন।

জীনপুর যাব গুরু পথ বলে দাও
দেহবৃক্ষের পাঁচ ডালে ঢুকে গেছে কাল
শেকড়ে ক্ষুধার্ত কালো মুষিক-মচ্ছব
আটটি কুঠুরি গুরু ভিজে গেল ঘোলা অন্ধকারে
দশম দরজা থেকে মার্কেপ্টানের গন্ধ ভেসে আসে।

'এই যে দেহবৃক্ষের পাঁচ ডাল' এ তো সুফি সাধনার পারস্যফল। অপরদিকে ভারতীয় তন্ত্র সাধকেরা হাজার হাজার বছর ধরে যে গুরুপরম্পরার সাধনা করেছেন তারই 'ঈশক' সাধনতন্ত্র এই কবিতা। যা পাশ্চাত্যের আধুনিকবাদীরা কোনো প্রকারেই চিন্তা ও কল্পনার ধারণ করতে পারবে না প্রাচ্যের এই 'মানুষরতন'।

সমালোচনার জায়গা আছে, সমালোচনা সবকিছু নিয়ে করা যায়, কিন্তু কায়সারের তপ্ত যৌবনে লেখা এই মধুমাখা প্রেমানুভূতি আর মরমিয়া ভাব নিয়ে শুধু আমার অনুভূতিই ব্যক্ত করলাম এই পাণ্ডুলিপিটি পাঠান্তে।

মালার্মে কথিত দৈবের 'অপলোপসাধন' কবির পক্ষে অসম্ভব। তেমনি মহৎ প্রতিভার ক্ষেত্রেও কালজয়ী কবিতা লেখা মূলত অর্জন সাপেক্ষে। রাইনে মারিয়া রিলকের মতো ব্যক্তিগত জীবনের তুমুল বহেমিয়ান বিশৃঙ্খলার ছাপ আমরা লক্ষ করব কায়সারের জীবনযাপন ও কবিতার মর্মে, কবিতার শরীরে। নিজের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হতে হতে দেহাত্মা আর পরমাত্মার সম্মিলন ঘটিয়ে শেষ কবিতায় ভারতীয় দর্শনে মগ্ন কায়সার গুরুর স্মরণাপন্ন হয়েছেন—এই গুরু হয়তো আত্মশোধনের, এই গুরু হয়তো পরমাত্মা, এই গুরু অচেনা, এই গুরুর কাছেই তিনি অচিনপুর, জীনপুরের পথের খোঁজ জানতে চাচ্ছেন—এই পথ অচিন পথ, এই পথ প্রাচ্যের, মৌলিক দর্শনের পথ, এই পথেই লুকায়িত প্রাচ্যদর্শনের আদিপাঠ :

জীনপুর যাব গুরু পথ বলে দাও
দেহ ধুনে ধুনে একা বিয়েছি বিভ্রম
বিভ্রম ধুনে এহেন শূন্যে ভেসেছি
জীনপুর পাই কোথা গুরু শুধু পথ বলে দাও।

ক বি তা ক্র ম

শঙ্খনদীতীরে ১৫
স্মৃতি ও বিভ্রম ১৬
এক প্রলয়ংকরী চুম্বনের পর ১৭
মনোলগ ১৮
মৃত্যু অথবা মডার্নিটি ১৯
শিশির ২০
লাল পিঁপড়া ২১
নাট্য-দৃশ্য ২২
প্রেত-নৃত্য প্রহর ২৩
আশ্রয় ২৪
রাত তিনটে চল্লিশ মিনিট ২৫
ঘুম ২৬
সেলুলয়েড কাব্য ২৭
ক্রান্তিকাল ২৯
স্মৃতি ৩০
গোঁ ৩১
আহ্বান ৩২
তুষার ৩৩
রক্ত ৩৪
হস্ত-বিবৃতি ৩৫
সাধ ৩৬
ফেরা ৩৭
৩৮ আপেল
৩৯ রক্তপাত
৪০ ডুব
৪১ ক্রন্দন ও সংগম
৪২ চুম্বন
৪৩ আত্মহনন
৪৬ জনম জনম গেল
৪৭ সিলভিয়া
৪৯ আগুন
৫০ কুক্ষণ
৫১ হাত ধরো
৫২ কালসাপ
৫৪ সিন্নি
৫৫ বাবা
৫৬ নখ ও জিভ বিষয়ক
৫৭ রক্ত-বুদবুদ
৫৮ একা
৫৯ জীনপুর
৬০ শীতকাল
৬১ গুল্মগীতি
৬২ প্রবঞ্চনা
৬৩ চোরাবালি

শঙ্খনদীতীরে

চাই, এবার খেয়ানৌকোখানার মাঝিও দূর থেকে হাঁক পাড়ুক :
—কেন, কেন এই শঙ্খনদীপারে দাঁড়িয়ে আছ বাহে?
শীতে, রক্ত-গোধূলি বেলা, একা?
ধীরে চারদিকের জলস্পন্দন সব থামুক
আরও রক্তপাত হোক নিঃশব্দে
আরও রক্ত, অশ্রু, সন্ধ্যা ও কুয়াশা নামুক, রূপ
ও রোদনভরা এই রূপনারায়ণের কূলে;
আরও শূন্য আরও শূন্য আরও শূন্য হয়ে উঠুক
এই শঙ্খতরঙ্গতীর!

অদূরে কাশফুলের কম্পন স্থির হয়ে আসুক যেন
নিজের ফিসফাস, নিজের বিড়বিড় সব নিজেই শুনতে পাই
আর জানি, তুমি হয়তো ঠিকই ফিরে আসবে
এই শঙ্খনদীপারে, রক্তধূলিপথে;
অন্তত প্রথম আত্মহনন ও অজস্র পুনর্জন্মের ফাঁকে;
এক সন্ধ্যায়।

স্মৃতি ও বিভ্রম

ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে লক্ষ লক্ষ স্মৃতি ও বিভ্রম
মানুষ যেনবা সাপ আর সাপ যেন খরগোশের ছানা;
সস্নেহে জড়িয়ে ধরে
কানে ও গলায় ভাবছি চুমো খাবো কি না

ধারালো বর্শা হাতে যারা আজ দাঁড়িয়ে আছে, দূরে—
তাদের পেছনে আঁকব কংসবতী নদী; পাশে নিরীহ নিরস্ত্র এক প্রাচীন মন্দির

জেগে উঠছে সব স্মৃতি...
মহিয়সী অরিহন্ত এক
নিজের আঙুল দিয়ে লিখেছেন এই পিঠে
জ্যোতির্ময় অক্ষরবৃন্দ, ফাল্গুন পূর্ণিমার রাতে
অনুমানে বলেছি, প্রেম—আঙুলের গতিবিধি বুঝে...
মাঝে মাঝে ভেবেছি চুম্বন
গূঢ় শব্দ ছিল আরও; আরও আরও গূঢ় অর্থ—কোনোদিন তলিয়ে দেখিনি
ওই সব মর্মলিপি—সবই কি খুইয়েছি তবে দিনে দিনে অকাতরে
বিচিত্র বিচিত্র খেয়া, জীবনের বহুবিধ কূলে উপকূলে?

কে আছ শরীরবিদ, পিঠ খুঁড়ে দেখো কিছু
অবশিষ্ট আছে কি না আজও!
ওই যে স্পর্শটুকু, আঙুলের ওই সব অলৌকিক ভাষা
খুঁড়ে খুঁড়ে দেখি আজ কয়েক ছত্র লেখা যায় কি না

এক প্রলয়ংকরী চুম্বনের পর

বলিনি? এই চুম্বনগুলোই টিকে থাকবে
এই সব মরণশীল মাঠ নদী প্রেম স্মৃতি ও গ্রহানুপুঞ্জ
ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাবে সব, ধীরে

এই যে দাঁড়িয়ে আছি সহস্রবর্ষ প্রাচীন প্যাগোডার নিচে
এই দৃশ্যে অক্ষয় শুধু আমাদের জলোন্মাদ ওষ্ঠ-অভিসার
চতুর্দিকে যা দেখছ—কালগর্ভে লুপ্ত হবে সব

শুধু লক্ষ সৌরবর্ষ পরও আমাদের ছায়া
তারপর আমাদের ছায়ার ছায়া, ছায়ার ছায়ার ছায়া
ছায়ার ছায়ার ছায়ার ছায়া...পান করবে একে অপরের রক্ত
একে অপরের আত্মা
একে অপরের অস্থি এবং অস্তিত্ব
ইসরাফিলের শিঙা বেজে ওঠার পরও...

মনোলগ

দেখো, পুরোদস্তুর নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে
দেবদারু গাছের ছায়ার নিচে শান্ত মন্দির,
আইজাক লেভিটানের আঁকা নিঃসঙ্গ ঘোড়ার ছবি,
লাল দ্রাক্ষারসের কয়েকটা বোতল, গুনে গুনে কখানা বই, শৈশবের দুখানা ঘুড়ি,
যদি অত্মহত্যা করতে হয় অগত্যা—সুইসাইড নোট লেখার জন্য একটা কলম, একপাতা কাগজ আর
মায়ের হাতে বোনা শীর্ণ রুমালখানা ছাড়া আর কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ থাকবে না

এক রোববার মধ্যরাতের পর হৃৎপিণ্ড খুলে ওয়ার্ফ নদীর জলে তিনবার করে ধুয়ে ফেলতে হবে
আর ঝলসে যাওয়া অংশগুলো, ছাইগুলো, ভস্মগুলো, ছোপ ছোপ রক্তের দাগগুলো শক্ত ধাতুর স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করো যেন দূর থেকেও খুব চকচকে দেখায়,
যেন কোনো গ্রিক রূপসী হৃৎপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে সহসা কোনো ভুতুড়ে ছায়া দেখে আঁতকে না ওঠে;
ধোও যেন কোনো স্মৃতি না থাকে
ধোও যেন কোনো প্রদাহ না থাকে
তারপর এক সোমবার ভোরে জামার দুই আস্তিন গুটিয়ে দৌড়াতে শুরু করো পুরোদস্তুর নিঃস্ব মানুষের মতো
কিছুতেই কোনো পিছুটান নেই
কোনোদিকেই কোনো হাতছানি নেই
যেন দূরে, বুধাপাদীপ মন্দিরের পাশে বসে কেউ টিস্যু দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছে ভেবে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে না হয়

দৌড়াও নিঃস্ব হয়ে
রাত্রি এলে আশ্রয় নিও নতুন নতুন সরাইখানায়
আর পথিমধ্যে যদি আবার কোনো রক্ত, অশ্রু ও হৃদয়খেকোর সঙ্গে দেখা হয়,
তাকে খেতে দিও অবশিষ্ট রক্তধারা,
ধোয়ামোছা নতুন হৃদয়।

মৃত্যু অথবা মডার্নিটি

টানা দশ ঘণ্টা আতশবাজি শেষে নতুন বছর শুরু হলো
মাত্র কিছুদিন আগে
তারপর এই যে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি
রাজস্থানের মরুভূমিতে এক প্রকাণ্ড উটের পিঠে চড়ে
টপ্পা গাইতে গাইতে
এই যে একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি
একে অন্যের দৃষ্টিসীমা থেকেও দূরে—
একটা মানুষ এবং একটা উট থেকে ক্রমে শুধুই
একখানা বড় পীপিলিকা এবং একখানা কালো বিন্দু হয়ে
যে যার মর্মন্তুদ অশ্রু ও হাহাকারে এই যে নিরুদ্দিষ্ট হচ্ছি ধীরে
এর নাম মৃত্যু নাকি মডার্নিটি—
জিজ্ঞেস করে রাখছি ভাষাতত্ত্বের সব দার্শনিকের কাছে!

শিশির

মধ্যরাতের পর আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না

এই যে মাটির গভীর থেকে উঠে আসছে মৃত সব কঙ্কালের বিলাপ
ওই যে হাহাকার করে উঠছে একজোড়া একা ওষ্ঠ
আর এই সব আশ্চর্য পেখম—
কোথায় কোথায় যেন ভেসে চলছে সব
মাঝরাতের পর

যদি নিরীহ সব বায়ু-রন্ধ্রে আচমকা ঢুকে পড়ে লোভ ও ঔদগ্র—
এই ভয়ে সংগম-পিপাসাও ধীরে মরে যায়

মাঝরাতের পর খুব মরে যেতে ইচ্ছে হয়
হামির গাইতে গাইতে একটা একাকী নদীর জলধারা
গান্ধারে এসেই ভেঙে পড়ছে অঝোর কান্নায়
তখন একবিন্দু শিশিরের ভেতর, ভাবি,
আরও একবিন্দু শিশির হয়ে ঢুকে পড়ব কি না!

লাল পিঁপড়া

জগতের সব পদ্ম-সরোবর ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি ফুটেছিলে বালুতটে
একটা একেলা পাখি সমুদ্রতীরে আমাদের শিয়রের পাশে বসে ছিল অনেকক্ষণ
দীর্ঘশ্বাস...
দীর্ঘশ্বাস—বোধকরি আরও গভীর একাকিত্বে ডুবে যেতে যেতে তুমি অথবা আমিই ফেলেছিলাম, একান্ত গোপনে...
ট্রেনে ফেরার পথে তুমি কি সত্যিই শরীরে ছেড়ে দিয়েছিলে ডাঁসা ডাঁসা লাল পিঁপড়া? গুচ্ছ গুচ্ছ বিষ-বিছা?
নিশীথ রাতেও এরা দলবেঁধে অঝোরে দংশিছে...

নাট্য-দৃশ্য

কিছু রক্ত সঞ্চয় করে রাখছি
পরবর্তী দৃশ্যের জন্য...

এই সব স্থূল ঝড় থেমে যাবার পর
এক শান্ত ম্লান মাস্তুল-নোয়ানো সন্ধ্যায়
আমাদের দেখা হবে
মাঝখানে কালো গহ্বরের স্থলে
একটা নদী থাকলে ভালো হয়
এতকাল আত্মদহনে যদি তোমার মুখখানা পুড়ে যায়;
মুছে যায় চিবুকের অপার্থিব জ্যোতির্ময় রেখাগুলো
একখানা মশাল বরং জ্বালিয়ে রাখতে পারো
মুখের কাছে

পরের দৃশ্যে
একটা লুপ্ত ভ্রূণ ডুকরে কাঁদবে
ধূপের সব আগুন নিভে যাওয়া অবধি;
তোমার চোখও ঝাপসা হয়ে যাবার কথা, ক্রমে...
কিছু রক্ত সঞ্চয় করে রাখছি
এমন অমোঘ মঞ্চে
বক্ষ খুলে কাঁদতে পারি বলে...

প্রেত-নৃত্য প্রহর

জেগে আছি
ও ঘনযামিনী রে...
ফাঁকা মাঠ, মঠ ও মন্দির—শুধু রাউলির ডহর থেকে আচমকা ভেসে আসছে অর্ধমৃত ময়ূর আর মৎস্যের বিলাপ
ওহো তট ও তারিণী—
আমরা কি প্রায় উপনীত হয়েছি রক্তে কাঁটা দেওয়া তথোক্ত প্রেত-নৃত্য-প্রহরে?
শুনতে তো পাচ্ছি—গোপনে কোথাও বেজে চলছে ঘুমপাড়ানো অলৌকিক ঘুঙুর!
লক্ষ লক্ষ খেঁকশিয়ালের নিদ্রাতুর, নীরব জৃম্ভণ!
আমাদের অতৃপ্ত পূর্বপুরুষেরা কি সহসা জেগে উঠে নিঃশব্দে মাতম জুড়েছে এই নিষ্ঠুর বটের খালে, অগাধ নিশীথে?

জেগে আছি...
ঘুম-দষ্ট ভুবনের ওপর নীরবে রচনা করছি নিজের ভাস্কর্য !

আশ্রয়

বনে বনে সব শিকারি সহিসেরা আগুন, সংগম আর মাংস-মচ্ছবে মেতে উঠেছে
গো জয়তুনের রসে টলমল একাকিত্ব
গো ওয়ার্ফ নদীর কুয়াশা, মালহাম কোভের গহন বুদবুদ
আমায় উন্মাদ আলিঙ্গনে জড়িয়ে রেখো আরও কিছুকাল!

মদোন্মাদ সব শিকারি সহিসেরা উল্লাস করছে, দূরে
গো রক্তগলা বেদনা, তোমার স্তনরন্ধ্রে কি আশ্রয় দেবে বাকি রাতটুকু?

রাত তিনটে চল্লিশ মিনিট

দূর স্টেশনে ক্লান্ত রেলগাড়ির শব্দ মিইয়ে যাবার পর
রাত তিনটে চল্লিশ মিনিটে
ক্ষুদ্রান্ত্রে যে অদৃশ্য ক্ষুধাগুলো জেগে ওঠে ধীরে
যে ঘোড়ার খুরের শব্দ
অশ্রুতপূর্ব যে কথা-প্রবাহ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ হয়ে বুকে লুটিয়ে পড়ে
যে মগ্ন শৈশব, যেসব অনুক্ত স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে;
আর রক্তে বুদবুদ তোলে যে আত্মধ্বংসের নেশা
এবং এই যে মনে হয়—সব ব্যর্থ, সব পরাজয়
বরং একটা একাকী গাছের গলা জড়িয়ে ধরে, ভাবি,
গলা ছেড়ে কেঁদে উঠি; আর লোকেরা ভাবুক
হয়তো একটা বিপন্ন ট্রাম রাস্তাচ্যুত হয়ে কোথাও থুবড়ে পড়েছে
এই যে প্রেম ও মৈথুন সব বৃথা বৃথা বৃথা মনে হয়...

এখন রাত তিনটে বাহান্ন মিনিটে জানতে ইচ্ছে করছে একজন ভাষাবিজ্ঞানী,
একজন মনোবিজ্ঞানী
একজন পাঁড়-মূর্খ এবং একজন জ্ঞানী
একজন সফল এবং একজন বিফল প্রেমিক
এই বিষয়গুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করেন!

ঘুম

ভাবছি, এই ভাঙা চোয়াল আর কুঁজো কাঁধ নিয়ে
আর ঘর থেকে বাইরে বেরোব না
টেলিফোনের তার কেটে দেব
বরফ মাড়ানো জুতোগুলো কালো বিন-ব্যাগে ভরে
রাস্তায় স্ক্র্যাপভ্যানে রেখে আসব
আমার চিবুকে যে বাজপাখির ছায়া দেখে এক উদ্‌ভ্রান্ত কিশোরী
সহসা আঁতকে উঠেছিল
ভাবছি, বরং সেই ছায়ার সঙ্গে তলোয়ার হাতে
নেমে পড়ব এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে
আর আমার রক্তের অন্ধকার থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুনো শালিখ উড়ে যেতে দেখে
মনে পড়ে
কলাশাস্ত্রে এক অভিজ্ঞ রমণী আমাকে শিখিয়েছিলেন পাখি ধরার দুর্দান্ত কৌশল
তার কথা ভেবে ভেবে আমি বরং কিছু কাশফুল বিসর্জন দেব গোপনে

ভাবছি আর বাইরে বেরোব না
বাতিগুলো নিভিয়ে দেব অলক্ষ্যে
আর দূর বরফ পাহাড় থেকে বিটোভেন যে ভুজঙ্গ তিরগুলো ছুড়ে দেন নিঃশব্দে
হৃৎপিণ্ডে সেই তিরগুলোর দগদগে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে
বরং আমি ঘুমোতে যাব; আর নিভৃতে ঘুমিয়ে রবো গভীর রাত্তিরে

সেলুলয়েড কাব্য

ঐ দূরে...
এতটুকুই কথা—ফিসফাসের মতোই শোনাবে যেন দূ থেকে রে তে এসে কোমল রেখাবের মৃদু ধোঁয়ায় ও ঘন গোলকধাঁধায় ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাতে পাহাড়চূড়ার নিচে, গভীর খাদে ও ঘন গাছগাছালির ভেতর রেখাবের চিরবিষণ্ন নীরবতা, উপরন্তু শ্রবণাতীত প্রতিধ্বনিও ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে—ওই দূরে...।

তারপরেই নীরবতা; পাতার সরসরটুকুও আরও গভীর, আরও মিহি ও মর্মন্তুদ নৈঃশব্দ্যে মিইয়ে যেতে থাকলে তারা একে অপরের দিকে তাকায়; যেন সহসা কে যে আঙুল দিয়ে 'ওই দূরে' বলে বিড়বিড় করে উঠেছিল নিজেরাই আর ঠিক মনে করতে পারছে না।
দূরে? দূরে মানে কোথায়? দিগন্তের ঠিক কোথায় তাকালে দূর মনে হয়? এই প্রশ্নটা মনে এলো বটে কিন্তু ঠিক কার মনে এলো প্রথম?

দুজনের সন্নিহিত দুই পাঁজরের মাঝখানে নৈঃশব্দ্য ক্রমে আরও গভীর, গূঢ় ও ঘনীভূত হবে। অস্তাচলে সূর্য ডুবছে দিকচক্রবালব্যাপী রক্তের ফিনকি তুলে! তাতে ছোপ ছোপ রক্তকুয়াশা জমছে এখানে ওখানে; সকলের অলক্ষ্যে যে বাস্তুভিটা দাঁড়িয়ে আছে, তার জানালায়ও! কে যে কার কোন হাতখানা জোরে চেপে ধরে ঘন ও গভীর শ্বাস ফেলতে শুরু করেছে, তারপর ওই দূরে ওই দূরে ওই দূরে, অস্তাচলে ডুবন্ত সূর্যের দিকে, দিগন্তের দিকে নিজেদের চোখ মূর্তির মতো স্থির করে রেখেছে! কিন্তু এমন সূর্যাস্তবেলায়ই কেন মানুষ একে অপরের হাত খোঁজে?
এমন সব দৃশ্যে এবং এই সব নৈঃশব্দ্যে ফলত উহ্য থাকে পাতার সরসর, ঘাসের অস্ফুট ফিসফিস, বুনো পাখির ডাক, কয়েক লক্ষ পাঁজরের মর্মর, আরও কিছু, আরও গভীর কিছু!
অনেকক্ষণ চুপ মেরে বসে থাকতে থাকতে দুজনের কার যে সহসা ঘাসভরতি মাঠে ঘুড়ি ওড়ানোর স্মৃতি মনে এলো; বেতবনে একে অপরকে পেঁচিয়ে দুটো আশ্চর্য সুন্দর সাপের দীর্ঘ সংগম দেখার স্মৃতি মনে এলো অথবা দুজনের ঠিক একই সঙ্গে মনে পড়ল বলেই হয়তো ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসেই পরক্ষণেই আচমকা মুখ ফিরিয়ে নিল দুজনেই; পাছে এই নৈঃশব্দ্য নিজেই নিজের অবয়বে এবং অভ্যন্তরে যে জটিল ভাস্কর্য রচনা করেছে, করে যাচ্ছে—তা ভেঙে ছত্রখান হয়!

কিন্তু কে গো ওই তৃতীয়জন যে ডুকরে কেঁদে উঠছে দুজনের মাঝখানে, এই মেঘ ও মৃত্যুমুখী প্রদোষে?

বিগত জন্মের কোনো প্রেম? দুঃখী কোনো নদী? কে?
সূর্য ডুবে যাবার পর একজন আরেকজনের হাত ধরে আরও আরও আরও শক্ত করে; অন্যজন গালে, গলায়, কপালে ও কানের লতিতে চুম্বন করতে গিয়ে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

দূর থেকে এই দৃশ্য যারা দেখতে পাচ্ছে, তারা বাড়ি ফিরছে চোখের জল আড়াল করতে করতে! কেউ তবু নীরবতার ভেতর আরও গভীর নীরবতা রচনা করতে করতে হাঁক পাড়ে—ওই যে দূরে!
দূরে আজ আর কী কী হচ্ছে গো?

ক্রান্তিকাল

রত্নানদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি
জগতের অন্যান্য নদীর মতো রত্নাও এখন বিলুপ্তপ্রায়
ভরা শ্রাবণ মাসে বৃষ্টির একটু ক্ষীণ ধারা বয়ে যায় শুধু
রাখালেরা কথায় কথায়—এই নদী ঘিরে যে মিথগুলো
যে উপকথাগুলো আমরা শুনে এসেছি শৈশবে—
গরু চরাতে চরাতে সেই গল্পগুলো জাবর কাটে
একে অন্যকে শোনায়

এই নদীতীরেই আমাদের শুরু
কোনো না কোনো নদীতীরেই তো আমরা আসলে শুরু করি
তীরের কোনো বাঁকে দাঁড়িয়েই প্রথম আকাশ দেখে আমরা আঁতকে উঠেছিলাম
নদীকূলেই তো আমরা সঞ্চয় করেছি জীবন, বিত্ত আর বিবিধ বৈভব
তীরবর্তী বিস্তীর্ণ মাঠে মেষ চরাতে চরাতে আমরা কেউ ত্রাতা হয়েছি, কেউ প্রেমিক
আবার কেউ বা প্রবঞ্চক
আমাদের প্রণয়, চুম্বন আর ধ্যানোন্মাদ সংগমের ভেতরও
একটা নাতিশীতোষ্ণ নদীই বয়ে যায়; তীরে রাইখেত, আদিগন্ত ইলামের মাঠ!

শৈশবে শুনেছি রত্নানদীর ঢেউয়ে বাণিজ্যের সব ধন হারিয়ে
এক শস্য-সদাগর কেঁদেকেটে সেই যে দক্ষিণের পথে হেঁটে গিয়েছিলেন
কোনোদিনই আর ফিরে আসেননি
হয়তো কেউই ফেরে না।

এই নদীপারে সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত আর হেরে যাওয়া সব মানুষের গল্প শুনতে শুনতেই
আমরা বেড়ে উঠেছি।
এই নিষ্ঠুর উপকূলে আমরাও কেউ হারিয়েছি বাণিজ্যের ধন
কেউ বা নিজের রক্তোৎসারিত প্রেম ও আরাধনা-মগ্ন সংগমের সঙ্গী
কেউ আবার বিসর্জন দিয়েছি শস্যদানা, আরও আরও কী কী সব যেন

রত্নানদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি
তারপর কেঁদেকেটে লোকালয়ে ফেরে কেউ
অন্যসব হাঁটে আরও দক্ষিণের পথে...
কখনো ফেরে না!

স্মৃতি

শীতকাল আসছে
ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে
সেদিন সুইস্সটি লেকে খড়ের আগুন পোহাতে পোহাতে কেউ একজন বলল—
এবার ডিসেম্বরে নাকি ভারি ঠাণ্ডা পড়বে

এন্টার্কটিকার আয়তন হু হু করে বাড়ছে
জগতের কোথায় কোথায় নাকি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে
কোথায় কোথায় কী সব যেন হচ্ছে...

লোকটা খড়ের আগুন পোহাতে পোহাতে বলেছে,
এমন শীত আসছে যে মানুষের মুখ সহসা কুঁকড়ে যেতে পারে
হাঁটু জমে যেতে পারে
জিভ অবশ হয়ে যেতে পারে

আমার ভয় নেই
শীতবস্ত্র ছাড়াই দিব্যি আমার শীতকাল কেটে যায়
আর তাতে বিস্মিত হন পাড়া-প্রতিবেশীরা

ডিসেম্বর আসুক
শীত আরও ঘন হয়ে পড়তে শুরু করলে
আমিও ধীরে ধীরে গোপন সিন্ধুক থেকে বের করব
আমাদের ধ্বংসোন্মুখ, প্রলয়োন্মুখ, প্রজননোন্মুখ গূঢ় চুম্বনের স্মৃতি!

গোঁ

শুঁড়িখানার সঙ্গী, সুরা, পানপাত্র সব ফেলে এসেছি
এখন খুব তুষারপাত হোক
মাঝে মাঝে তুমুল বজ্রপাতও; কে না কে মারা গেল—তাতে আমার কী

একটু একটু করে না-হয় অন্ধকারও নামুক
আমি ব্রিজের ওপারে রূপকুমারী নদী পার হয়ে
একটা উইলো গাছের নিচে বসে জিরোব
ক্ষয়িষ্ণু দালানের ছাদ থেকে কে না কে হাতছানি দিয়ে ডাকছে
তাতে আমার বয়েই গেল!

আহ্বান

যিশু নই, ত্রাতা নই—জগতের শেষ প্রেমিক বলছি, শোনো, যদি তোমাদের মাঝে আমার পরেও আর কোনো প্রেমিক অবতীর্ণ হতো, সে হতো নিঃসন্দেহে ওই তিরবিদ্ধ হরিণ শাবক, নিষ্ঠুর ব্যাধ এসে যার জনক-জননীকে হত্যা করেছে বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে, দৌড়ে পালাতে গিয়েও যে রেহাই পায়নি, ঊরু আর বক্ষ ভেদ করে গেছে অব্যর্থ তীর। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জীবনের মায়ায় বিভোর ওই হরিণ শাবকখানা, ভাবো, রাগ ভীমপালশ্রীতে গাইছে জীবনের শেষ আর্তগাথা; শেষ মাতম, অস্তায়মাণ রৌদ্রের শেষ ব্যালাড!
দূরে আলো নিভে যাচ্ছে, পশ্চিম সমুদ্রে ঝাঁপ তালে টানা আছড়ে পড়ছে অপার্থিব রক্ত-তরঙ্গ

তুষার

পাশে, অবশ্য ঠিক পাশে নয়, বেশ খানিকটা দূরে বসেও নেহাত কী করি, কেন করি জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বেজায় নাক ঘামতে শুরু করেছে দেখে, গালে টোল-পড়া যে মেয়েটা গমগম করে হেসে উঠেছিল এক চৈত্র-সন্ধ্যায়; এই শূন্য রাতে, কেন যে তার কথা ভেবে ভেবেও খুব মন কেমন করছে, হায়—বড় নিষ্ঠুর এই তুষার-প্রবাহ!

রক্ত

আলো সরোবর থেকে তুমি ছুড়ে দিয়েছ এই সব কনকনে শীত-ফুল আর তুষার-প্রবাহ
হৃৎপিণ্ড গলতে শুরু করেছে...
ভোরে সারা শহর ভরে যাবে আমার ছোপ ছোপ রক্তে...

হস্ত-বিবৃতি

অতঃপর জিহ্বা খসিয়া পড়িল। টানা গদ্যে কাশিয়া উঠিল হাত। অনন্তর আঙুল কহিল, প্রভু, আরাধনা-মগ্ন গাছেদের গায়ে আগুন ধরাইয়াছি। ধ্যান-বিভোর যত ঘুম-সরোবর রক্তে ভাসাইয়াছি। আর লোহার শাবল দিয়ে সেই সব মন্দির ভাঙিয়াছি যা সযত্নে লুকানো ছিল মানুষের গোপনতম গুহায়।

বায়ু ধীরে বহিল। বজ্র-নিনাদে প্রশ্ন উঠিল—আর কেন তুমি তা পালন করিয়াছ নির্বিকার, একের পর এক?

হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, ঘুমে ও জাগরণে আমাকে তো মস্তিষ্কের অধীন করিয়া দিয়াছিলে, প্রভু।

মস্তিষ্কে প্রাণ সঞ্চারিত হইল। দূরে জলদ গম্ভীর কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, তোমাকে মন্ত্র দিয়াছিলাম আর কেন তুমি তা ছিটাইয়া দিয়াছ ধ্বংসে, ক্ষয়ে, সমূহ সংহারে?

মস্তিষ্ক আড়মোড় ভাঙিয়া কহিল, প্রভু! আমি তো মুহূর্তে মুহূর্তে শুধু তোমারই আদেশ পালন করিয়াছি।

এমন বৃক্ষও কি আছে যার একটি পাতাও নড়িতে পারে, যদি না থাকে তাতে তোমার গূঢ় ইশারা?

সাধ

জলমগ্ন নিধুয়া পাথারে। নিঃশব্দ অনলে পুড়ি নিশিদিন; প্রদোষে প্রত্যুষে। কে তুমি উজানে যাহো; কে গো সখী ঢেউ তোলো পরানের গহিন পবনে।

ধু-ধু পন্থ! ভাওল্যা ভাইস্যা যায় যমুনার জলে। আমারে একেলা থুইয়া কোথায় যাবে গো বন্ধু; এই বেলা বুকে জ্বলে তুষের আগুন। উজানে ভাসালে পানসি চক্ষে ঝরে শাউনিয়া ঢল।

আসমানে সিঁদুর রং! চিলমারি বন্দরে সখী নেমে এলো সাঁঝ। তোমার আঁচল ধরে এইবার ফিরিবার সাধ...

ফেরা

খোঁপায় এটেছ দেহ; অলকে বেঁধেছ হাত
ময়ঙ্ক আঁখির শর হেনেছ এ বুকে
কামের কোদণ্ড ভুরু এবার কি ছোঁয়াবে দুচোখে?

কেন যে ফেরাতে চাও? আমার তো রক্তে সখী
আবাল মাটির ডাক; অনন্ত গুহাব্রত, আমূল সন্ন্যাস
ঘুমন্ত নদী ও চন্দ্র, উড্ডীন বালিহাঁস
হাতছানি দেয় নিরবধি
জোছনায় নয় শোনো; বিস্তীর্ণ অন্ধকারে মুখ ঢেকে রাখি

তবু বাঁধো লোকালয়ে; ওখানে কি পাবে সখী ডালে ডালে পাতার প্রপাত?
ওখানে কি পাবে নদী নির্জনে বয়ে গেছে ধু-ধু?
ওখানে কি পাবে ছায়া কেঁপে ওঠে কলোচ্ছল জলে?

ডেকে যায় বুনো অশ্ব; লিলুয়া পবন ধীরে কড়া নেড়ে যায়
ঘুরে দাঁড়াতেই যেন বিঁধে অন্ত্রে তোমার নোঙর
ঝরে রক্ত পথে পথে; ওড়ে ঘুড়ি গাঢ় বেদনায়

সভ্যতা ছিঁড়িব দোঁহে; আদিম অরণ্যমূলে ফিরে যেতে চাই
পাথরে পাথর ঠুকে পরিশুদ্ধ হতে চাই পুনঃ
তোমার বিনম্র ওষ্ঠে পাপিষ্ঠ রক্তের ধুলো মুছে নিতে চাই

ক্রমশ পারদস্তর ঢেকেছে এ শরীরের দ্যুতি
...প্রেমে ও বৈরাগ্যে খুঁজি গৌতমের প্রত্ন-প্রতীতি

আপেল

কী আশ্চর্য গো এই আপেলফল!
বাকলে কেঁপে কেঁপে উঠছে ক্ষণে ঈশান আবার ক্ষণে বিষাণমুখো আগুনের ফ্লেম;
উপরন্তু ঘুম-সরোবরের ছায়া!

রক্তপাত

জেগে আছি পাহারায় সদর দরজায় বসে
তুমি ঘুমাও
একটা ঘুমনদী বয়ে যাক তোমার ওষ্ঠ, চিবুক, আর স্তনযুগলের খাঁজ বেয়ে...
দুপাশে কিছু উপনদীও জেগে উঠুক
যোনি ও জঙ্ঘায় অবিরাম রক্তপাত হচ্ছে;
হোক

রীতি হলো—
জগতের সব মহান নদীই জেগে উঠেছে
এমন অনাবশ্যক রক্তধারা বয়ে যাবার পর

ডুব

চোখ বন্ধ রেখো...
নদীচক্রে কে ডুবে মরল, কোন ব্রিজ সহসা ধসে পড়ল তাতে কী
এই ওষ্ঠ-অভিসার চলবে
এই আরাধানা চলবে
এই চুম্বন ঢুকে পড়বে আমাদের মগ্নচৈতন্যের এক দিগন্ত থেকে আরও গভীর মেঘমালায়, মেঘান্তরে, আরও আরও আরও গভীরে...
পায়ের নিচ দিয়ে ভূমিকম্প যাবে, যাক
প্রলয় আসলে আসুক

ক্রন্দন ও সংগম

রাতভর সফল সংগমের শেষেও বুকভাঙা কান্নায় লুটিয়ে পড়েছি আর জেনেছি জগতের সমস্ত মহান শিল্প, সমস্ত মহান সংগীতের শেষ বিন্দুতে আসলে থাকে এক অনির্বচনীয়, এবং বলতে গেলে প্রায় ব্যাখ্যাতীত নৈঃশব্দ্য আর অন্তহীন ক্রন্দন...

ক্রন্দনেই ফুরাল এই সব গূঢ় শিল্প; শিল্পভৌম এই নশ্বর জীবন!

চুম্বন

জ্যোতিষী বলেছে
হাসপাতালে রোগ যন্ত্রণায় নয়
আমার মৃত্যু বরং হবে সাঁড়াশি চুম্বনে; নেশাতুর ওষ্ঠ-অভিসারে
এক জমকাল সন্ধ্যায় আমাদের দেখা হবে
অর্থাৎ
আমি ও আমার যম—চতুর্দিকে নিস্তব্ধ নগরী
প্রতিটি চুম্বনের আগেই তাই সযত্নে গ্রহণ করি মৃত্যু-প্রস্তুতি

ও সুবল রে...
এরে কি চুম্বন বলে, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু যেথা যথা উহ্য নাহি?

আত্মহনন

একজন থেকে আরেকজন, আরেকজন থেকে ঠিক এর পরেরজন, এমনি লোকমুখে কথা চাউর হয়ে যায় চারদিকে—সব ঠিক হয়ে যাবে আবার! স...ব—ঠিক আগের মতো!

ঠিক হয়ে যাবে সব?

ওই যে বুধাপাদীপা মন্দিরে যাবার পথে ছায়ামেঘ, রোডেডনড্রেন গাছের সারি, চাফিঞ্চ-নাচা পত্রকুঞ্জের নিচে নৈঃশব্দ্যের ভেতর দুখানা মাটির পিণ্ডই তো, ঘুরে ঘুরে ঘুরে প্রথমে একটা বৃত্ত অতঃপর সহসাই ক্রমে নিরাকার হওয়া বা হয়ে ওঠা; ওই ওষ্ঠ-রক্ত-জিভরন্ধ্রে মরণোন্মুখ সব চুম্বনের পর প্রকারান্তরে আরও অনাবিল জীবন ফিরে পেয়ে বরং ব্রাইটন সমুদ্রপারে আরও চার ঘণ্টা বেশি বালুস্নান—সব তাহলে ফিরে ফিরে ফিরে ফিরে ফিরে ফিরে আসবে ঠিক আগের মতোই?

টগবগে রক্ত ফোঁটার দিন—আরও বুদবুদ আরও বুদবুদ আরও রক্তিম; পূজামণ্ডপের সামনে সিঁথিরেখায় পরিয়ে দেওয়া সিঁদুরের মতো টকটকে লাল ওই সব রক্ত ফোঁটার দিন—সত্যিই ফিরে আসে? আদৌ কি আসে?

কিছুই আসে না; আমরা সকলেই হাঁটি—এগোই অথবা পিছুই—যে যার পথে, যে যার নিয়মে একে একে!

কিছুই ঠিক হবার নয়; উপরন্তু বৃন্তচ্যুত, কীটদষ্ট, এদিক-ওদিক উড়ে বেড়ানো নিরীহ একখানা পাতার নিয়তি, অভীষ্ট নয় অথচ প্রায় নির্দিষ্ট জেনেও, শূন্য খেয়াপারে একা অপেক্ষায় নিরন্তর বসে থাকার নাম কি আসলে প্রেম নাকি আত্মহনন—এই কথা কাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি আজ; এই ক্রূর নিশিবেলা?

১.

আমার কউম, শোনো! জীবন হলো আসলে সেই পথিকের গল্প যাকে কিনা পেছন থেকে তাড়া করছে এক হিংস্র শার্দুল। হাঁপাতে হাঁপাতে পথের পাশে একটা গাছের ডাল বেয়ে যদিও বা পথিক মগডাল অবধি আরোহণ করতে পেরেছে কিন্তু তাতে কী—গাছের নিচে এসে ক্ষুধার্ত শার্দুল অপেক্ষা করছে আর হুংকার ছাড়ছে একের পর এক।

প্রায় সংবিৎবিহীন এবং আতঙ্কে পাথরবৎ পথিক সহসা দেখতে পায় তার হাত, হাতের কবজি, হাতের কনুই বেয়ে চলছে এক সুগন্ধি রসের ধারা। মাথা তুলে উপরে তাকাতেই সে আবিষ্কার করে তার হাত আসলে দেবে গেছে গাছের ডালে নয়; এক বিশাল মৌচাকে। হাতে বয়ে যাওয়া মধুধারায় জিভ লাগাতেই পথিক ভুলে যায় গাছের ঠিক নিচেই হুংকার ছাড়ছে এক ক্ষুধার্ত শার্দুল।

হে আমার কউম, শোনো! এ হলো এমনই এক মধু যাতে একবার জিভ ছোঁয়ালেই জিভ আর ফেরানো যায় না কিছুতেই। এমনই এক মধু যার রসধারা পানে মানুষ

নিজেরে ভোলে; আত্মবিস্মরণ ঘটে, রক্তকুহরে ব্যাখ্যাতীত এক নেশা জেগে ওঠে। আর পথিক যখন মধুপানের নেশায় বিভোর, তখনই আবার শত শত উন্মত্ত, পাষাণ্ড মুষিক ধারালো দাঁত দিয়ে গাছের ডালগুলো কাটতে শুরু করেছে। পথিক টের পাচ্ছে অথবা পাচ্ছেও না যে অচিরেই, গাছের ডালগুলো কাটা পড়লেই, সেও নিমিষেই নিক্ষিপ্ত হবে শার্দুলের ঠিক হা-করা ক্ষুধার্ত মুখে; মুখগহ্বরে!
তোমাদের কাউকেই নয়, হে আমার কউম; কায়সার নিজেকেই ডাক পাড়ছে এবার, রে কায়সার! রে মহোন্মাদ মূঢ়! পারস্য রূপসীর সৌন্দর্যে আর গোলাপের রেণু ছড়ানো ওষ্ঠের মধু-খনিতে কত আর ডুবে রইবি রে বাছা! দেখ, একপাল ধারালো দাঁতের মুষিক এসে এই পঞ্চবি ডালের তরুবর ক্ষয় করছে প্রতিনিয়ত। চেয়ে দেখ, নিচে হুংকার ছাড়ছে সেই চিরচেনা হিংস্র-ব্যাঘ্র। জাগ, তুই জাগ রে বাছা!

২.
চার মিনিটের একটা সিনেমা!
মিড লং শটে দেখা যাবে তোমার পায়ের কাছে কুর্ণিশ করছে মালহাম কোভের সারি সারি পাহাড়!
তোমার কোমর ছুঁয়ে বয়ে গেছে স্রোতঃস্বিনী ওয়ার্ফ!
আর ক্লোজ শটে দেখা যাবে
হেমন্ত সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারেও ছড়িয়ে পড়ছে তোমার দ্যুতি!
জ্যোতির্ময় মুখ!
তারপর সুযোগমতো
সবার অলক্ষ্যে সন্নিহিত পাহাড় আর বনভূমিতে আগুন ধরিয়ে দিলেই
লেলিহান অগ্নিশিখা ছায়ার মতো কেঁপে কেঁপে উঠবে তোমার চিবুকরেখায়, ওষ্ঠে; রক্ত-মদির গালে!
ক্লোজ শটে এই দৃশ্য চলতে থাকবে যতক্ষণ না তোমার মুখ ধীরে এক স্ফুলিঙ্গমান বহ্নিঝড়ে মিলিয়ে যায়!

৩.
মাঝে মাঝে ওই ডাক, ওই গূঢ় হাতছানি মর্মমূলে অদৃশ্য গুঞ্জন তুলতে শুরু করে!
কে ডাকো?
কে বাহে?
'নগরনামা' বলে আমার এক গল্প আছে, লিখেছিলাম মধ্য-নব্বই দশকে। সায়েম নামে গল্পের প্রধান চরিত্র সহসা শোনে, শুনতে পায়, পেছন থেকে কে যেন ডাকছে। কিন্তু পাশ ফিরে এদিক-ওদিক কাউকেই আর দেখা যায় না। কে?...সায়েম বিড়বিড় করে...কে বাহে? মৃত্যু? স্মৃতি? প্রেয়সী? শৈশব?
এ এক অমোঘ ডাক, বোধকরি গল্পের নির্মাতা আর গল্পের চরিত্র সবাইকেই একই বিন্দুতে দাঁড় করিয়ে দেয়; দিয়ে দূর থেকে ক্রূর হাসি হাসে। কেন এক রহস্যময়

শিস বেজে চলেছে নিরন্তর নিষ্ঠুর অটামের পত্রঝরা এই মর্মবেদিতলে? কে ওখানে? কে বাজাও এই অমোঘ শঙ্খ-মন্ত্র-নাদ?
স্মৃতি?
ওহো স্মৃতি! নাকি মৃত্যু?
রংধনুর অপার থেকে ভেসে আসছে আগুনের লেলিহান মশাল হাতে ওই যে এক স্মিত অথচ চির-রহস্যময় মুখ; কুশিয়ারা-পারের ধানখেতে বসে তার ওষ্ঠ আর চিবুকের কুয়াশা পান করেছিলাম সারা রাত, মনে পড়ে।...ওই যে ভিড় করছে শতসহস্র মুখ; মুখের মন্তাজ—কায়সার হে কায়সার, দেখো সকলেই ডাক পাড়ছে—আয়! আয়! আয়!
মৃত ভাই ডাকছে আয়
বড় দাদি সহাস্যে ডাকছে, ভয় নেই, আয়!
কৈশোরের মৃত প্রেমিকা পার হয়ে এসেছে দীর্ঘ বাঁশ-বেতের সেতু; হাত উঁচিয়ে ডাকছে—এসো!
কিন্তু আমি কোথায় যাব হে? কে আমাকে রেখে গেছে ঊন-মানুষদের মেলায়; এখন কেনই বা সহসা ডেকে নিয়ে যেতে চায়।
কে যেন বললে—বিদায়! বিদায়? পৃথিবীর জলে ও ধুলায় কি তবে আমার অধিকার ফুরাল হে ওয়ার্ফ নদীর ক্রিসিন্থমামগুচ্ছ?
চোখে এত ঝাপসা দেখছি কেন? চোখের ফেরেশতা কি সহসা একদিন এসে বলবে, হে মানবসন্তান, সারা জগৎ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তোমার দেখার জন্য একবিন্দু আলো নিয়ে আসতে পারিনি?

এত শ্বাসকষ্ট লাগছে কেন হঠাৎ? দমের ফেরেশতা কি শিগগিরই একদিন এসে বলবে, হে মানবসন্তান, ভুবন চষেও তোমার পরবর্তী দমের জন্য একটু বায়ু আর খুঁজে পাইনি?
যেন সারা জগৎখানি এমনকি ক্ষীণ সব বালিকণারও; শুধু আমারই কিছু নেই। যেন সকল কপট মানুষেরা বাইরে কৃত্রিম অনুকম্পা নিয়ে দিকে দিকে প্রচার করছে, শোনো, এই আলোয় ভরা ভুবন এখন থেকে শুধুই আমাদের, যারা ঝরে পড়ছ, যাও!
একশ বছরের জীবন যে পেল, আর দশে, বিশে, তিরিশে, চল্লিশে যাদের ঝরে যেতে হলো জগৎ বদলে দেবার স্বপ্ন বুকে নিয়ে—এই সব বৈষম্যের বিচার কে করবে হে! শেষ বিচার বলে কিছু থাকলে বরং এই সব সীমাহীন বৈষম্যের জন্য স্বয়ং ঈশ্বরকেই নরকে নিক্ষেপ করা উচিত। দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজের প্রবাহে কয়েক লক্ষ বছর তার মাথা ঠেসে ডুবিয়ে রাখা উচিত!
মৃত্যু কি এক অনন্ত চুম্বন?

হে চুম্বন হে আলিঙ্গন আমাতে অবতীর্ণ হও, ধীরে!

জনম জনম গেল

নজরুল কেন লিখেছিলেন এই রক্ত-শক্তি-স্বস্তি ও অস্থিক্ষয়ী পঙক্তি—'জনম জনম গেল আশা পথ চাহি'? কী অব্যর্থ একখানা গানের স্থায়ী—শুনলে এমনকি পাঠ করলেও কত জন্ম-জন্মান্তরের বেদনা বুকে এসে জমা হয়; কত কত জন্ম যে অসার, বৃথা ও অর্থহীন করে দিয়ে কেউ কেউ শুধু 'একবার পায় তারে'; পায় আসলে? নাকি পাওয়ার এক বিভ্রম তৈরি হয়, তারপর শূন্য নদীতীরে এক ভয়ংকর সন্ধ্যায় তাকে হারায়ও এবং অবশেষে জন্মের পর জন্ম তাকে আবার খুঁজে বেড়ায়?

তমসনদীতীরে প্রেম, প্রণয় ও মায়া উপচে পড়া সন্ধ্যায় এক কিন্নরী গেয়েছিলেন এই গান! স্বপ্নে নাকি 'অর্থ, কীর্তি ও সচ্ছলতাময়'—এমনই বাস্তবে? কিন্তু জানো তো, রাগ বাগেশ্রীর উদর ও অন্তরাত্মায় থাকে হাজার হাজার তৃণ-হরিণীর নাভি-নিংড়ানো কস্তুরি কিন্তু তাতে কি শুধুই থাকে ঘ্রাণ ও অশ্রুভরা নৈঃশব্দ্য? হাউমাউ করা রোদন নয়? বাগেশ্রীর ওই বিলাপ, ওই আরও মিহি আরও মিহি আরও ক্রন্দন হয়ে ওঠা হাহাকারগুচ্ছ, কী গোপন, কী গহন, গূঢ় ও গম্ভীর গায়নে ধরা দিয়েছিল, তিরতির করে কাঁপছিল কিন্নরীর গলায়; আর 'চাহি'তে এসে, মাত্র কয়েক মুহূর্তের উচ্চারণে জন্ম-জন্মান্তরের সব প্রেম, সব বেদনা, অপেক্ষার সব ক্লেদ কি উপচে পড়েছিল—না-হয় এমন বিষবিক্ষত দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরব কেন ওই মোম, হৃদয় ও যৌবনপোড়া রাতে? ওই 'আশা পথ চাহি'র 'চাহি'ই তো শুধু গুনগুন করেছি সারা রাত, প্রকারান্তরে জন্ম এবং জন্মন্তরের মাঝখানে যত কাল, যত মুহূর্ত অথচ দেখো, ঠিক পরক্ষণেই মনে হয়েছে কোথায় কখন কার যে আসার পথ চেয়ে আছি আসলে, জানি কি আদৌ? নাকি তমসনদীপারে আরও দশ বিশ তিরিশ বছর পর এক অবর্ণনীয় বিয়োগব্যথায় গুমরে কেঁদে উঠব বলে স্বপ্নে, ঘুমে ও অবচেতনে এই পথ চাওয়া, এই অপেক্ষার অপার্থিব সংগীত বেজে চলেছিল মনে; ক্ষণে ক্ষণে? এখনও কেন যে ওই 'চাহি'র ঘোর, মোহ এবং বেদনার জটিল আবর্তটুকুতে কাঙালের মতোই থমকে দাঁড়াই!

বাগেশ্রীর পাঁজর ফুঁড়ে তমসনদীতীরে সন্ধ্যা নামে, আরও ঘন ও গভীর হয়, ক্রমে! আর ওই 'চাহি', আর ওই অবিস্মরণীয় গায়নও হয়তো নদীর জলের মতোই হারিয়ে যায় অন্য কোনো ভুবনে, আরও অন্য কোনো গগনেও! দশ, বিশ, একশ বছর পর ওই পথ চাওয়ার প্রেমটুকু, ক্লেদটুকু অথবা বাক্স-পেটেরায় দিলীপ কুমার রায়ের বিশাল রচনাসমগ্র নিয়ে তমসপারে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতিটুকু কেন যে ঘুরে ঘুরে রাতবিরেতের ঘুমটুকুও কেড়ে নেয়—রীতিমতো বিস্ময় যাই এই ভোরে, বাইরে এক জীবনের সমস্ত বসন্তঋতু বিলীন ও বিলুপ্ত হচ্ছে ধীরে!

সিলভিয়া

নিষ্ঠুর তুষারপাতে যখন হেয়ারহিলসের পত্রপল্লববিহীন গাছগাছালি খাঁখাঁ করছে, এমনই এক সর্বনাশা এপ্রিলের দিনে এক মানবী, যাকে কিনা দেবী বলে ভ্রম হতো, চুপিসারে এসে ফিসফিস করে বলেছে,
আমাকে সৃজন করো, তোমার সৃষ্টি হবার গৌরবটুকুই চাই শুধু!
তুমি ছাড়া কোনো অবলম্বন হোক, চাই না...
তুমি ছাড়া শ্বাস নিতে পারি—চাই না
তুমি ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি—চাই না
এমনই সর্বৈব এই সমর্পণ!
আর বারবার সে আঁকড়ে ধরেছে অক্টোপাসের মতোই, যতবারই কৃত্রিম অভিমানে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছি...
কী মোক্ষম একখানা পঙক্তি গো লিখেছেন আমাদের বরিশালের ছাওয়াল জীবনানন্দ? 'প্রেম ধীরে মুছে যায়...'
যায় নাকি?—বলে নিজেই তো নিজের অন্তঃপুরের দিকে শ্যেন তাকিয়ে আছি গূঢ় বেদনায়...
মানুষ কীভাবে পারে? এত মিথ্যা এত অবিকল সত্যের মতো আওড়াতে জানে, কীভাবে?
কিন্তু মানুষই তো পারে...মিথ্যেকে সত্যের মতো বলতে পারাই তো শিল্প...অভিনয় কি শিল্প নয়, বাহে?
তবু মনা রে
মন তো বড় পোড়ে!
অমাবস্যা পূর্ণিমায় ধিকিধিকি জ্বলে অথচ কোনো ধোঁয়া নেই—এ কীসের দহন গো দশগ্রামের মানুষ?
জ্বলে তো জ্বলুক!
পুড়ুক, পোড়াই তো নিয়তি! পুড়ে পুড়েই তো শুদ্ধ হতে হয়; পুড়ে পুড়েই নাকি নির্বান জোটে—কে বলেছেন এই কথা? বুদ্ধ নিজেই কি?
কিন্তু দেখো, মানুষ বদলায়...জীবন বদলায়, আরও কত কত কী যে বদলায়...আমিও তো ঘর বদলেছি দুমাস হলো...সত্ত্বা বলে অভিহিতি যে পায়, সে ও হয়ে ওঠে 'আশপাশের পরিচিত মানুষ' আর আশপাশের মানুষেরাই হয় পরম স্বজন? এতেই তো প্রমাণ হয় পৃথিবী ঘুরছে! ঘুরছে? তাতেই কি দূর মাঠে প্রায় প্রতি নিশীথে কেউ গেয়ে চলে একের পর এক অমোঘ অথচ আর্ত-ট্রুবাডোর? মনে হয় এক প্রবল ঘূর্ণাবত্যা-প্রবাহ বইছে, দূরে নয়; ঠিক অন্তরাত্মায় যেন?

এই বদলকে আসলে মানতে জানতে হয় আর যারা পারে না, তাদের মেনে নিতে হয় সিলভিয়া প্লাথের মতো ওভেন চেম্বারে নিজের মুখমণ্ডল নিজেই পুড়িয়ে দেবার নিয়তিও!

হেবডন ব্রিজে সিলভিয়া প্লাথের সমাধিতে গিয়ে কাল আরও একবার মানুষের অন্য এক মুখ নাকি মুখোশের স্মৃতি মনে এলো। এমন সব মানুষের, একটু আলোয় একটু অন্ধকারে, যারা প্রকারান্তরে কবি, প্রকারান্তরে শিল্পী, প্রকারান্তরে কমেডিয়ান! সিলভিয়া বেঁচে থাকলে তার মাথায় আজ হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতাম, শোনো! সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে যে চুল কেটে ফেলে এসেছ, তার জন্য দুঃখ কোরো না কিশোরী। তা এখন ধুলোয় গড়াগড়ি দিক আর না-হয় কোনো ন্যাড়া মাথার কেউ কুড়িয়ে নিয়ে তা নিজের মুণ্ডুতে রোপণ করুক! তোমার মাথায় করে যতদিন সযত্নে রেখেছ, সেই যত্নটুকু বরং এখন বাকি চুলগুলোতে নিয়োজন করো! সিলভিয়া কি শুনতেন? সিলভিয়া কি হেসে উড়িয়ে দিতেন?

আগুন

এই সব হত্যা ও রক্তপাত দৃশ্যের আড়ালে
কেউ নিশ্চয়ই গোপনে আমার জন্য লুকিয়ে রাখে
ঘুমবাহী নদী আর ভীষণ লোধ্ররেণু;
চোখের গভীরে পুষে রাখে কিছু পারলৌকিক সমুদ্রসারস
আর আমার বুকের দিকে নিভৃতে উড়িয়ে দেয়; ডুবে গেলে পঞ্চমীর রক্তঝরা চাঁদ

এই সব তীব্র তির, লক্ষ্যভেদী খঞ্জর আর আমার ঝাঁঝরা হৃৎপিণ্ডের বিপরীতে
কেউ নিশ্চয়ই আমার জন্য অগোচরে জমিয়ে রাখে
অতিশয় কুয়াশা কিছু...আর গাঢ় জলের সৌরভ...
কেউ নিশ্চয়ই আমার জন্য নাভিমূলে ঢেকে রাখে লেলিহান আগুন...

কুক্ষণ

এসো এসো এসো—বলে দিগন্তে ওই যে নিরবধি ক্রূর হাতছানি দিয়ে ডেকে যাচ্ছে কেউ, এই যে বিদায়-বিউগল বেজে চলছে বল্টন এবিতে, মন্দিরে মন্দিরে, নদীতীরে বৃক্ষবেদিতে—যাব?
যাব?
কী হবে তবে, ওই যে ভেবেছি মালহাম সরোবরে তাঁবু ফেলব এক আগুন পূর্ণিমার রাতে?
কী হবে, বেন নেভিসের পাদদেশে ওই যে একবার, একবারই, শুধু একবার রক্ত-অস্থি-মাংস-উজাড় করা চুম্বনে ভেসে, ব্যাপে, ছড়িয়ে, মিশে থাকতে চেয়েছি?

ইস্ট ইউরোপে, রোমানিয়ায়, ইয়োগোস্লাভিয়ায় হিমালয়-কারাকোরাম-আল্পসের গুহায় গুহায় ওই যে ঘুরে বেড়াব বলে ভেবেছি আর মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততম সংগীত, অকৃত্রিম হৃদয়ের ভাষাকে লোকালয়ে নিয়ে আসব বলে কথাও দিয়েছি?

কিন্তু এই যে সংগীত, যাকে মানুষের আদিমতম, সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম বলে মানি, কিছু কি সত্যি সত্যি হয় এসবে?

কিন্তু, এই লোভই তো আদিম রে মনা! এই লোভই তো জগতের একমাত্র মৌলিক শাসনতন্ত্র! নয়?
দেখো, এই মোহান্ধ মানুষই তো রচনা করেছে ভুবনজোড়া এক পুঁজির সাম্রাজ্য! এই প্রায় নিশ্ছিদ্র পুঁজিবাদ!
তবু পূর্ব আকাশে চাকতির মতো ফুটে ওঠা রামধনু ভেদ করে ওই ক্রূর হাতছানি আসে! মৃত্যু আসে!

কী টালমাটাল এক সময় আর দুর্যোগ আমরা পার করেছি মাত্র কিছুদিন আগেও! সব অর্থেই একে অপরের থেকে দূরে সরে যাওয়ার কী মর্মভেদী এক চক্রের ভেতর আমরা ঢুকে পড়ছিলাম ক্রমে!

কে কাকে কোন সান্ত্বনার কথা বলি গো এই নির্মম কুক্ষণে!

হাত ধরো

বারুতখানা রোডের ধারে হাঁটছি যখন
স্ল্যাবের চিপায় পা ঢুকিল হঠাৎ কখন
গোসাঁই, আমার হাত ধরো নয় ভেসে যাব চেনার স্রোতে

নিচে কালো পুরীষস্তূপ আর চেনা তো নয়; পুঁজ-প্রবাহ
সইতে নারি সইতে নারি আহা মরি!
গোসাঁই আমার হাত ধরো গো!

কালসাপ

সূর্য ডুবে যায়...

আর আমি ঘরের দাওয়ায় বইস্যা সোফায় নাধাইর গীত গাই। নাধাইর গীত গাই গো আমি চিত হয়া ঘুমাই, ও আমার ভাঙা ভ্যানে জং ধরেছে, পায়ের পাতায় হুল ফুটেছে, বিষে মরে যাই গো দারুণ বিষে মরে যাই, ও আমি কেমনে দেশে যাই!

পদ্মা মা গো পদ্মা মা
প্রণাম রাঙা পায়
কালনাগিনীর দংশনে তোর
পুত্র মারা যায়।
সূর্য ডুবে যায়...

কারা দেখো কুজন করে, লাল নভে কি ফুটল তারা? বলই হাওড় ঢেউয়ের তালে গান ধরিল কোন মাঝি গো! আমার তো হায় সন্ধ্যা হলো ঈশান কোণে মেঘ জমিল, অগ্নিকোণে ধুলোর ঝড়ে আন্ধা হয়া যাই। আমার উত্তরেও তাম্র পাহাড়, দক্ষিণেও ধাতব নদী, পূর্ব-পশ্চিম ঊর্ধ্ব অধে কেউ দিল না ঠাঁই! ও আমায় কালনাগিনী ছোঁ মারিল, রক্তে সাপের বিষ ঢুকিল, বিষের জ্বালায় কেন্দেকেটে একলা পথে রই।

গুমোট ঘরে ফ্যানের হাওয়ায়, সিগারেটের ছাই উড়ে যায়, সোফায় বইস্যা দিন কেটে যায়, ও আমার হাঁটু ভাইঙ্গা নিদ আসে গো, বিছনা-বালিশ কই?

আমার ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা, রোদে জ্বালা, ছায়ায় জ্বালা, কার গো আমি পাকা ধানে মই দিয়াছি, কাঞ্চা আইলে পাও দিয়াছি; পাড়ায় পাড়ায় ঘুইরা আমি কার গো গিবত গাই? আমার ভাঙা ভ্যানে জং ধরেছে কেমনে দেশে যাই।

কালদুপুরে জারে জারে চইলতা পাতা ঝরে
চইলতা গাছে কালনাগিনী একলা বসত করে
চইলতা গাছের শাখায় শাখায় মৌমাছিগণ ওড়ে
মৌচাকে মৌ কানায় কানায় ওলওলি গো করে

ও আমি মৌয়ের চাকে হাত দিয়ে কি নুনের গোলায় জল ঢালিলাম...বিষে মরে যাই গো দারুণ বিষে মরে যাই!
আমি পান দিব গো গুয়া দিব গো
পঞ্চমুখে খাও
কালিয়া কালনাগিনীর বিষ রে
সমুদ্দুরে যাও!

কে যেন বা কান্দে কোথায়, কোন বনে গো কোন বা গুহায়, তারে আমি খুঁইজা ফিরি! গলাইমা গুল্মকাঁটা হাঁটুইমা পথের কাদা, কে আমারে পথ দেখাবে, কে গো আমায় ডাইকা নেবে, ও হায়রে কেন্দেকেটে একলা আমি পথেই পড়ে রই, ও আমার আন্ধার ঘরে কোন উন্দুরে খায় গো পাতা-দই?

বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ঈশান কোণে মেঘ জমিল কোন আঁধারে কোন বাদাড়ে এই দেহখান থই?

সিন্নি

ডুবে যাচ্ছি মায়া-পারাবারে!

এবার বদর হাঁকো, তুশা সিন্নি মানো মাঝি শাজলাল বাবার মাজারে

দোহাই জিন্দাপির দোহাই মনসা মাগো দোহাই তোমার
গহিন সায়রে মা গো কী হবে উপায়!

এ কোন কুহক সিন্ধু, ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্বলে প্যারাফিন
চারদিকে জলরাশি; বাদম ছিঁড়ল বুঝি ঈশনি বাতাস!

মুর্শিদ মন্ত্র দাও গো এ কালনিশীথে
সরল শিষ্যের বৈঠা তুলে নাও হাতে
আমি তো অক্ষম গুরু ঝড়ে ও ঝঞ্ঝায় নাও বাইতে শিখিনি
নিশিদিন শুক্রপাতে হাওয়ায় ভাইস্যা গেল সাধের যৌবন

মুর্শিদ, ধরো গো হাত, না-হয় ডুবছি এই অকূল পাথারে!

বাবা

কোথাও কোনো বুড়ো মানুষের ছবি দেখলেই কেন যেন বাবার মতো মনে হয়—
এটা বাবা না? বাবাই তো!

সাদা আলুথালু চুল, চোখদুটো ধীরে ঢুকে পড়ছে অক্ষি-কোটরায়...
যেন কথা বললেই এখনই শুরু করে দেবেন সেই একই ফিরিস্তি—কোন বোমা বর্ষণের কালে কোন পুকুরপাড়ে কীসব চারাগাছ যেন তিনি রোপণ করেছিলেন ইত্যাদি...

আজ দেখি ফেসবুকে এক অসুস্থ বুড়ো মানুষের জন্য দোয়া ভিক্ষা চেয়ে কেউ একজন পোস্ট দিয়েছে
ছবি দেখে শিউরে উঠেছি সহসা
এটা বাবা না?
এই তো আমার বাবা!
কী অসুখ হয়েছে গো বাবার?
বাবা—বলে তারস্বরে কেঁদে উঠব কি না ভাবতে ভাবতেই জুম করে বুঝে যাই এটা বাবা নয়

সেদিন পারমিতাদের বাড়িতে কাকুকে দেখলাম
একের পর এক পাঠ করছেন জীবনানন্দ, বুঁদ হয়ে...
আমার বাবা এত জীবনানন্দ জানে না তবু এক অদ্ভুত বাবা বাবা ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছিল...
পেছন থেকে দেখে মনে হচ্ছিল এই তো বাবা
দাঁড়িয়ে আছে, ঠায়! পুত্র-কন্যাদের সব বেদনা বুকে নিয়ে!

যৌবনের পর সব পুরুষেরাই কি ক্রমে একটু একটু বাবা হয়ে ওঠে?
তাদের ঘামের সঙ্গে জুড়ে থাকে একটু একটু বাবা বাবা ঘ্রাণ?
নাকি অভিশপ্ত পুত্রেরাই জগতের সমস্ত ছায়া খুঁড়ে খুঁজতে থাকে বাবা?
তারপর এক বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস আড়াল করতে করতে
নিজেরাই একদিন বাবা হয়ে ওঠে?

নখ ও জিভ বিষয়ক

মোটের ওপর আমি এবং গৌতম বুদ্ধ দুজনেই এক বৌদ্ধ-পূর্ণিমার রাতে তেপান্তরের পথে পা রেখেছিলাম! এরপর দুজনেই থাকি হিমালয়ের চূড়ায়—জগতের এই সব সাইমুম আর ধুলো-প্রবাহে কী আসে আর যায় হে, কী আসে আর যায়!

এক মেঘলা দুপুরে গৌতম আমাকে ছেড়ে গেছেন আরও দূর বনের দিকে! আর সকলেই যেমন জানেন, আমার আছে টগবগে লাল রক্ত; ছুরির মতো ধারালো নখ আর কী আশ্চর্য ভারি সুন্দর একখানা লকলকে জিভও!

তারপর তো একই যুদ্ধ! একই যুদ্ধ; প্রতিটি রাতের শেষে শক্ত শাবল হাতে যদিও উৎখাত করি যাবতীয় নখের উত্থান; আর লকলকে জিহ্বামূলে যদিও পরিয়ে দেই ঐশি-মন্দিরের লৌহ-জিঞ্জির, তবু দিনে দিনে বাড়ে নখ। জিহ্বা—শুধু ক্ষণে ক্ষণে প্রসারিত হয়...

রক্ত-বুদবুদ

আমি যেন হোলি খেলার মাঠে
সব ভুলে
কোনো এক প্রাচীন শীতভোরে কুয়াশাভেজা নিঃসঙ্গ পাটকাঠি হাতে
নিজেরই ধমনিমূলে কেবলি রক্ত-বুদবুদ তুলে চলছি
কেবলি রক্ত-বুদবুদ তুলে চলছি
নিস্তব্ধ নুড়িপাথরগুলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে অপলক
আর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আগুন, সন্ত্রাস নাকি রক্তের ফিনকি?

একা

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে দেখি
খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে
কেউ দাঁড়িয়ে নেই কোথাও
বয়স বাড়ছে বলে কি না জানি না
আজকাল স্টেশনে কার যে দাঁড়িয়ে থাকার কথা
সেও ভুলে যাচ্ছি...
ল্যাম্পপোস্টের নিচে উড়ছে, নামছে, কিলবিল করছে
অগণিত স্মৃতি ও বিস্মৃতি...

জীনপুর

জীনপুর যাব গুরু পথ বলে দাও

দেহবৃক্ষের পাঁচ ডালে ঢুকে গেছে কাল
শেকড়ে ক্ষুধার্ত কালো মুষিক-মচ্ছব

আটটি কুঠুরি গুরু ভিজে গেল ঘোলা অন্ধকারে
দশম দরজা থেকে মার্কেপ্টানের গন্ধ ভেসে আসে...

দেহ ধুনে ধুনে একা বিয়েছি বিভ্রম
বিভ্রম ধুনে এহেন শূন্যে ভেসেছি

জীনপুর পাই কোথা গুরু শুধু পথ বলে দাও!

শীতকাল

শীতকালে যে পথে নামে সে আর ফেরে না
'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে' বলে কুয়াশায় ডুকরে ওঠে, তবু
প্রায় থ্যাঁতলানো পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরও দূরে
আরও দূরে মিলিয়ে যায় ধীরে; সে আর ফেরে না

'দেখো, মরে যাচ্ছি, তাতে তোমারও কষ্ট হবে খুব'
বিড়বিড় করে সে আবার নিজেকে সামলে নেয় বেশ
সন্ধ্যায় পাখিদের ঘরে ফেরা দেখতে দেখতে
একটা সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির মতো
একফোঁটা অসম্পূর্ণ অশ্রুর মতো
শীতে কুঁই কুঁই করতে করতে
পাহাড় সমুদ্র লোকালয় ও কয়েক কোটি একা অশ্বত্থের
হাতছানি ছেড়ে দূর সপ্তর্ষিমণ্ডলের খাদে সে হারিয়ে যায়
সে আর ফেরে না
সে আর ফেরে না
সে আর ফেরে না

গুল্মগীতি

একটু আলো এসে পড়ুক
ঠিক আলোও নয়; মোমবাতিগুলো পুড়তে শুরু করার পর
যে বিন্দুতে এসে তোমার নাভির গহন অন্ধকার আর জিহ্বার ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে
তেমনি কিছু নিভৃতি থাক; সৌরভও থাক এক আধটু
যেন অন্ধকারে তোমার মুখে, চোখে ও চিবুকে কেঁপে কেঁপে ওঠে মোমগলা আগুনের ঢেউ
ছায়া
আর দূরে বাজুক গুল্মগীতি, জলের রাফসডি

উইলো গাছের শাখায় একটা প্রণয়োন্মাদ ডাহুকও ডেকে উঠতে পারে;
তাতে বরং বাইরে তুষারকণাগুলো আরও করুণ হয়ে উঠবে
আরও বিলাপ-বিভোর হবে, আরও মন্ত্র-ম্যুহমান হবে
অতন্দ্র অস্থি-রন্ধ্রেও কেউ একজন ডুকরে কেঁদে উঠুক
রক্তের অন্ধকার থেকে আকাশের দিকে উড়ে উড়ে যাক কয়েক লক্ষ রক্তফুল

আর যদি তখন একটু চুম্বনের জন্য তোমার অথই ওষ্ঠের দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে থাকি
হে পরওয়ারদিগার, হাতের রজ্জুখানা আরও শক্ত করে ধরে রেখো
যেন নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ছড়িয়ে না পড়ে
যেন নদীগুলো বিপন্ন না হয়
যেন সমুদয় জল ও স্থল সহসা তুলোর মতো না উড়তে শুরু করে দিগ্বিদিক
যেন আমাদের তৃষ্ণাতুর ওষ্ঠযুগল ছাড়া বাকি সব এক অনন্ত ধোঁয়া-কুণ্ডলীর ভেতর হারিয়ে না যায়!

প্রবঞ্চনা

আজ দেখছি তোমার প্রবঞ্চনাগুলিই ছিল প্রেরণাময়ী

বার বার জেগে উঠেছি নিজেরই ভস্মস্তূপে
নিজের উড়ন্ত ছালিকণা জড়ো করে, ধীরে
ছাই-হাড়, ছাই-বক্ষ ছাইয়েস্য পাঁজর নিয়ে
ছাই-মেঘের ছায়ায় শুয়েছি

এখন দমে দমে যে ছাইকণাগুলি উড়ছে
তাতে মিশে আছে জীবন ও মৃত্যু নিয়ে লক্ষ লক্ষ নিগূঢ় জিজ্ঞাসা

চোরাবালি

যতবারই দেখা হয়, মনে হয় কতদিন পর...আহা!
বেত ও গুল্মবনের ঝোপে যেমন কুমারীলতার লকলকে জিভ দেখে আঁতকে উঠিছিলাম একদা, এমন যৌনতা ও জন্মান্তরের কত স্মৃতিই তো তোমাকে শুনিয়েছি...যৌনতা? এই শব্দের সঙ্গে ঠিক কী কী দৃশ্য জড়িয়ে আছে? কোন কোন মানুষের কোন কোন দৃশ্যের কথাইবা মনে আসে তাতে?

জগতের কোথায় কোথায় সূর্যাস্ত হচ্ছে গো এখন? কারা তবে ক্লান্ত পাখায় ভর করে বাড়ি ফিরছে? কারা, অন্ধকার নেমে আসার পর, গাছের মগডালে বসে মাতম তুলছে, নীড়ে ফিরে যেতে পারেনি বলে? আবার কেউ কেউ দেখো উড়ে, উড়ছে; যতদূরই উড়ছে, তাতে বাড়ি ফেরার পথ ক্রমে হ্রস্ব হয়ে আসছে! বুঝি না, সূর্যাস্তবেলায়ই কেন দেখা হয়! তুমি বাড়ি (বাড়ি? নাকি ধীরে, আমার কাছে, তোমার অমোঘ গন্তব্যের দিকে?) ফিরছিলে হয়তো অথবা সূর্যাস্ত থেকে আরও দূরে, সেই সব কুয়াশা-বিন্দুর পানে, আমরা দুজনেই বুঁদ হয়ে যা পান করেছি, দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, একে অপরের ওষ্ঠে, একে অপরের চিবুকে, একে অপরের গিরি ও সমুদ্রের খাঁজে; আরও কোথাও?

একটু একটু অন্ধকার নামছে মাঠে এবং তোমার মুখেও; কিন্তু তাতে দূর নক্ষত্রের আলোয় বরং আরও গভীর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে তোমার ঠোঁট—আমার শেষ (শেষ? একমাত্র নয়? অবধারিত নয়?) আশ্রয়! এই যে আমার দিকে তাকালেও না, অথচ চোখ নিচের দিকে রেখে, একান্তই স্বভাবসুলভ (স্বভাবসুলভ—কারণ এভাবেই তুমি কথা বলতে, অন্তত আমাদের ওই সব কুয়াশা-খননের দিনে), একটু একটু আড়ষ্টতাও পেয়েছিল বুঝি, জিজ্ঞেস করলে, মনে পড়ে না আমায়?
প্রশ্নের গভীরে একটু কৌশি-কানাড়াও কি বেজে উঠল অদৃশ্যে?
একটু আড়চোখে তাকালে আমার শ্বেতাঙ্গিনী বন্ধুর দিকে, পরক্ষণেই আবার চোখ ফেরালে, কিছু একটা অসংগতি চোখে পড়ল বুঝি?
শূন্য অডিটরিয়ামে, মঞ্চ থেকে একটু দূরে, থ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ, কেউ কি দূর থেকে দেখে ফেলেছিল এই অসহায়ত্ব; এই পুরোদস্তুর মূক হয়ে ওঠা—এত কঠিন এত জটিল এত কুজ্ঝটিকাপূর্ণ প্রশ্নের (শুধু কি প্রশ্ন? চোরাবালিও তো! কত গিরিখাদ কত তুষার কত মরীচিকা কত জল-বিভ্রম, কত হ্রস্ব নয় অথচ খুব দীর্ঘও নয় এমন সব শ্বাসও তো মিশে আছে এই চোরাবালির বিচিত্র রন্ধ্রে উপরন্ধ্রে) সামনে?

কিন্তু এমন প্রশ্নই কেন জিজ্ঞেস করো যা তিলে তিলে শেখা সব ভাষা ভুলিয়ে দেয় সহসা?
এর উত্তর কী হতে পারে অথবা জীবনভরই এর উত্তর খুঁজে বেড়াতে হবে কি না—এটা ভাবতে ভাবতেই মনে হলো ফিরে এসেছি, কিন্তু কোথায় ফিরেছি; আদৌ কি মানুষ কোথাও যায়, যেতে পারে, তার অনেক অনেক পরে তো হলো ফিরে আসা, ফিরে আসতে পারা?

মানুষ ফিরে?